ইউনিট ৮

বাংলাদেশের সংবিধান ও সুশাসন

পাঠ-১: বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সংবিধানের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পরবেন।
- বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে ও পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, আধুনিক বিশ্বে সংবিধান ছাড়া কোন রাষ্ট্রর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না তা সে লিখিত বা অলিখিত যাই হোক না কেন। রাষ্ট্রকে জানা যায় সংবিধানের দ্বারা। বস্তুত সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও ঐকমত্যের দলিল।

সংবিধানের সংজ্ঞা

সংবিধানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Constitution. শব্দটি Latin শব্দ Constituere (কনস্টিটিউয়ার) থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আদেশ প্রতিষ্ঠাকে সংবিধান বলে।

ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে কোনো দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার লিখিত এবং অলিখিত সকল প্রকার নিয়মকানুনকেই বোঝায়। লিখিত নিয়মকানুন বলতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রীতি ও আচার আচরণকে বোঝায়। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংবিধানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

এরিষ্টটল (Aristotle) এর মতে, "সংবিধান রাষ্ট্রের জীবনপদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে (A constitution is the way of life that the state has chosen for itself.)।"

এ. সি. **ফাইনারের** মতে, "রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধই সংবিধান।"

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, "সংবিধান হলো এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়।" (Constitution is the aggregate of laws and costoms under which the life of the state goes on.)

সুতরাং যেসব নিয়মকানুন ও বিধিবিধান দ্বারা সরকারের গঠন কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা এবং জনগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয় তাদের সমষ্টিকে সংবিধান বলে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

দীর্ঘ সময় পরাধীন থাকার পর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে সদ্য স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে। এ আদেশের ভূমিকায় বলা হয়, ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে ঘোষিত স্বাধীনতার আদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। এ ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রশাসনিক আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। অস্থায়ী সংবিধান আদেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো : (১) সংসদীয় গণতন্ত্র; (২) গণপরিষদ গঠন; (৩) নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান; (৪) শূন্য পদে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ; (৫) হাইকোর্ট ব্যবস্থা; (৬) প্রধান বিচারপতি।

গণপরিষদ আদেশ

১৯৭২ সালে ২৩ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে

নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হবেন। মৃত্যু এবং অন্য কোন কারণে বা আইনে অযোগ্য বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে সর্বমোট (১৬৯+৩০০) ৪৬৯ জন সদস্যের স্থলে ৪০৪ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব গণপরিষদের ওপর ন্যস্ড় করা হয়। পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করতে পারবে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১১৬ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। দুই দিনব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিন স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার আবদুল হামিদের মৃত্যুতে মোহাম্মদ উল্লাহ স্পিকার নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনে আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গটন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জুনের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট করতে বলা হয়। কমিটি প্রথম বৈঠকে করে ১৯৭২ সালে ১৭ এপ্রিল । সর্বমোট ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয় কমিটি । 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' বিভিন্ন মহল থেকে সংবিধান সম্পর্কে ৯৮টি প্রস্ড়াব ও সুপারিশ লাভ করে। এত কম সুপারিশের কারণ ছিল, বাংলাদেশের ভবিষৎ সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে আগে থেকেই এক ধরনের মতৈক্য বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া সংবিধানের রূপ-কাঠামো সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জুন কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। কমিটির সভাপতি ১১ জুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর কমিটি সর্বশেষ আলাপ-আলোচনা করে এবং সে দিনই সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর । এই অধিবেশনে খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ হয়। গণপরিষদে সাংবিধানিক বিলটির ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত।' সে সঙ্গে তিনি বলেন, এ সংবিধান দেশের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হবে। সংবিধান বিলটি উত্থাপনকালে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, এই সংবিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। এ সমাজব্যবস্থায় আইনের শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

খসড়া সংবিধানে চূড়ান্ত অনুমোদন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত মতামত, আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া সংবিধানে সর্বমোট ১০টি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর গণপরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের সংবিধানকে বিধিবদ্ধ করেন। সে দিন বেলা ১টা ৩০ মিনিটে গণপরিষদ সদস্যদের তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সেই মহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'একটি জাতি হিসেবে বাঙালিরা ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধান প্রণয়ন করলো।' ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তান দীর্ঘ নয় বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি। সেখানে মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান উপহার দেয় যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কয়েকটি বাম দল ব্যতীত প্রায় সব রাজনৈতিক সংগঠনই বাংলাদেশের সংবিধানকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সংবিধানকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে অভিহিত করেছে। । মূলত বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাজনৈতিক প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটেছিল। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ লাভ করল নিজেদের দ্বারা রচিত প্রথম সংবিধান। বাঙ্গালির হাজার বছরের ইতিহাসে তা এক অনন্য ঘটনা। বাস্তবিকই এই সংবিধান হলো বঙ্গন্ধুর ভাষ্য অনুযায়ী শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সংবিধান বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

২. অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ও গণ-পরিষদ আদেশ কে জারী করেছিলেন? এই আদেশের মাধ্যমে কীভাবে সংবিধান প্রণীত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২: বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক অধিকার, জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রের সংবিধান কেবল কিছু বিধিবদ্ধ আইন নয়, তা একটি জনসমষ্টির প্রগতির নিদর্শন। সংবিধান একটি আইনগত বিধান, যে বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও অংশের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার ঘোষিত হয়, ঘোষণা থাকে তা বাস্ড়বায়নেরও। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনো না কোনো সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। কেননা সংবিধান হলো রাষ্ট্রের জীবনপদ্ধতি যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে। তবে সব রাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য একই রকম নয়। নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা: বাংলাদেশ সংবিধানের ১ অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব রয়েছে। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত।

২। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি: ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল চারটি। এগুলো হলো : (ক) জাতীয়তাবাদ; (খ)সমাজতন্ত্র; (গ) গণতন্ত্র; ও (ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই মূলনীতিগুলোর পরিবর্তন আনেন। সেগুলো হলো-
(ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, (খ) জাতীয়তাবাদ, (গ) গণতন্ত্র এবং (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এ অর্থে সমাজতন্ত্র। অবশ্য সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে এ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতিই আবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

৩। মৌলিক অধিকার: সংবিধানের তৃতীয় ধারায় নাগরিকদের জন্য কতকগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার তাগিদে প্রগতিশীল সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান ঘোষিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে; সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা, সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা; বাকস্বাধীনতা; সম্পত্তির অধিকার; ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ।

৪। নাগরিকত্ব: বাংলাদেশ সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবে এবং তাদের এই নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৫। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এ সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ হবেন প্রকৃত দেশের শাসক। মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। ব্রিটেনে প্রচলিত সংসদীয় রীতিনীতিগুলো বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬। সংবিধানের সার্বভৌমত্ব: বাংলাদেশ সংবিধানে শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের বিধান রয়েছে। এখানে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই সংবিধানের সাথে সঙ্গতিহীন যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। জনগণের সার্বভৌমত্ব: গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।

৮। শাসনতন্ত্র সংশোধনীর বিধান: শাসনতন্ত্রের যে কোনো ধারা সংশোধন বা রদ করার জন্য পার্লামেন্টর দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহণের বিধান সংবিধানে রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা অংশগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

৯। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা: সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদলত 'সুপ্রিম কোর্ট' নামে অভিহিত হবে। আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্টে বিভাগ নিয়ে গঠিত এই সুপ্রিম কোর্ট শাসন বিভাগ থেকে কার্যকরভাবে পৃথক থাকবে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ প্রশাসনিক অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

১০। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রঃ বাংলাদেশের কোনো প্রদেশ নেই। সে কারণে এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত।

১১। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান : বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুষ্পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ এটি সহজে পরিবর্তন করা যায়না। তবে একেবারে অপিরবর্তনীয় নয়। এর পবিবর্তন করতে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার।

১২। এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাঃ বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর নাম 'জাতীয় সংসদ'। বিশ্বখ্যাত স্থপতি লুই কানের নির্দেশনায় শেরে বাংলা নগরে এটি নির্মিত হয়েছে।

১৩। নারীদের সমাধিকার : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের মতোই নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আইন করা যাবে না। জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বাংলাদেশ সংবিধানে রয়েছে।

১৪। মালিকানা নীতিঃ এ সংবিধানের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এখানে তিন ধরনের মালিকানা নীতি স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এগুলো হচ্ছে-১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ২. সমবায় মালিকানা এবং ৩. ব্যক্তিগত মালিকানা।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.২

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৩: বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠে শেষে আপনি

- বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন আনা হয়েছে কিনা তা আলোচনা করতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঠিক এক বছর পর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ মূলনীতির কিছু কিছু ধারায় পরিবর্তন করে আনে সামরিক সরকার।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের অন্যতম অলংকার হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সংযোজন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সর্বাধিক নাগরিক সেবা প্রদান করা। যেহেতু রাষ্ট্রের পুলিশি ভূমিকা এখন আর নেই, সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে সফল করাই আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান লক্ষ্য। সে কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযোজন করে আসছে। মূলনীতিগুলোর সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং আইনগত গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণে মূলনীতিগুলোকে National Manifesto, Highest Standard of Excellence এবং Decoration of Constitution বলা হয়ে থাকে।

পটভূমি

ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৩৭ সালে তার নতুন সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। ব্রিটিশ শাসন থেকে বের হয়ে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) ১৯৪৮ সালে যে সংবিধান রচনা করে তাতেও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করে। পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যরাও তাদের সংবিধানে (১৯৫৬, ১৯৬২) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ড় রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলতে আমরা সেসব নীতিকে বুঝি যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিকে আবার কর্মসূচিগত অগ্রাধিকারও বলা হয়। কারণ এগুলো সরকারের বিবিধ কর্মকান্ড পরিচালনার অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা দেয়।

রাষ্ট্রপরিচালনায় মূলনীতি অনুসরণের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ মৌলিক অধিকরের মতো এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ, জনগণের মেধা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ওপর। সরকার এসব নীতি বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করার জন্য। সরকার এসব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে সরকারের বিরুদ্ধে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য মামলা করা যাবে না যেমনটি করা যায় মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা যায়। সে কারণে সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নে চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় না।

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির প্রয়োগক্ষেত্র

বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলো আলোচনার আগে এসব নীতি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা আমাদের জানা দরকার।

সংবিধানের ৮(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলো কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে;

ক. দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক সূত্র বলে গণ্য হবে;

খ. আইন প্রণয়নকালে প্রয়োগ হবে;

গ. সংবিধান ও অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো দিশারী, নির্দেশক তথা মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে; এবং

ঘ. রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে সব নীতি।

১৯৭২ সালে রচিত মূল বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা

'মৌলিক আদর্শ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, অন্যান্য মৌলিক নীতি উপরোক্ত চারটি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে।

নিম্নে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

১। জাতীয়তবাদ: ভাষাগত এবং সংক্ষিপ্ত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি (অনুঃ ৯) ।

২। সমাজতন্ত্র: মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজলাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য (অনুঃ ১০)।

৩। গণতন্ত্র: বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে (অনুঃ ১১)।

৪। ধর্মনিরপেক্ষতা: ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান (অনুঃ ১২)।

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির শ্রেণীকরণ

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস পাব। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. **অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ:** সংবিধানের ২য় ভাগের ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯(২) এবং ২০ অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।
এগুলো হলো:

১. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে;
২. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে;
৩. গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হবে;
৪. কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে;
৫. শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র ;
৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র তিন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে;
(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা।
৮. যোগ্যতা ও কর্মানুযায়ী প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।

খ. **সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ:** ২য় ভাগের ১৪, ১৭, ১৮ অনুচ্ছেদে সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে :

১. রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করবে;
২. একমাত্র ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় মাদকদ্রব্য ও ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ;
৩. গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
৪. নিরক্ষতা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
৫. মেহনতি মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান; এবং
৬. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হবে।

গ. **আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতি:** ২য় ভাগের ৯, ১০, ২২, ২৩, ও ২৪ অনুচ্ছেদে আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এগুলো হলো:

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ;
২. জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ;
৩. ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়ন;
৪. জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ঘ. **পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতি:** ২৫ অুচ্ছেদের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ লক্ষণীয়। এতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চশিলা নীতি এবং জাতিসংঘ সনদের কথা রয়েছে। এগুলো হলো:

১. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;

২. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান;
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করা;
৪. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করা;
৫. আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদের নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা;
৬. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের স্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে এবং
৭. ইসলামী সংহতির কারণে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোদার করতে সচেষ্ট হবে।

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ড় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মৌলিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালে চারটি মৌলিক আদর্শের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। এ বিষয়ে তিনি চতুর্থ ফরমান জারি করেন, যা পঞ্চম সংশোধনীতে পাস করা হয়। সংশোধনী বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

১. **জাতীয়তাবাদ:** 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধরন বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ফলে 'নতুন জাতীয়তাবাদ' প্রশ্নে বিতর্ক থেকে যায়।
২. **সমাজতন্ত্র:** সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র।
৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা:** 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তত হয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়।

সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। অবশ্য একেবারে অবহেলাও করা হয়নি। জাতীয় সংসদকে এ মূলনীতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৭ অনুচ্ছেদে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা দখল, খনি সম্পর্কিত অধিকার বিলোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তবে এই আইন প্রণয়ন বিষয়ে যদি উল্লেখ থাকে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসভাকে মূলনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৩

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমূহ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমূহে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছিলো তা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪: বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণ অর্থে, মৌলিক অধিকার বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাকে বুঝায়। তবে রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের মৌলিক অধিকার এত সংকীর্ন নয়। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ব্যক্তির জীবন মান উন্নয়ন ও বিকাশে যা কিছু জরুরি তার সবই মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তবে সব রাষ্ট্র ও সংবিধান সমানভাবে মৌলিক অধিকারের পরিধি বিস্তৃত করেনা। ঠিক একইভাবে সব সংবিধান মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয় না।

পৃথিবীর যে কোনো সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলো একদিকে যেমন জনগণের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়, অন্যদিকে এগুলো শাসকশ্রেণীকে স্বৈরাচারী হওয়া থেকেও বিরত রাখে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার (১৭৭৬) পর থেকেই মূলত বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বা অধিকারের সনদ রাখার একটা রীতি দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মৌলিক অধিকারগুলো পরিবর্তনযোগ্য। তবে আইন পরিষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এগুলো পরিবর্তন করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য থাকে। মৌলিক অধিকারগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য বলে সরকার যেমন সচেতন থাকে, তেমনি জনগণ এসব অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।

মৌলিক অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি

মৌলিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকার বুঝি, যা কোনো দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকে। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার, তবে পার্থক্য এই যে মানবাধিকারগুলোকে বাস্তবায়নে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় না।

সুতরাং বলা যায় যে, যখন কতিপয় মানবাধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে তাদের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional Guarantee) দেয়া হয় তখন এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, এসব অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সেই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে ঐসব অধিকার ফিরে পাবে। আদালত তার রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে।

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মুনির State vs Dosso মামলার রায়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিচারপতি মুনিরের মতে, 'মৌলিক অধিকারের প্রকৃত উপাদান হলো, এগুলো কমবেশি স্থায়ী এবং দেশের সাধারণ আইনের মতো পরিবর্তনযোগ্য নয়।'

বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ১৭৮৯ সালের মার্কিন সংবিধান এবং ১৯৪৯ সালের ভারত সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের আলোকে মুজিব সরকারের গণপরিষদ বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযুক্তি করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে, ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন। মৌলিক অধিকার মোট ১৮টি।

সারসংক্ষেপ

মৌলিক অধিকারগুলো হলো এমন কিছু অধিকার যা কোনো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক সরকার তার শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকারকে অত্যন্ত যত্নসহকারে লালন করে এবং এগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। বস্তুত বর্তমান বিশ্বে শাসকশ্রেণীর সফলতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হলো তারা কতটুকু মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা জনগণকে দিতে পেরেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৪

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মৌলিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. 'বাংলাদেশের সংবিধান মৌলিক অধিকারের এক অনন্য দলিল' উক্তিটি আলোচনা করুন।

পাঠ-৫: বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের নিয়ামাবলী ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পরবেন।
- সংবিধান সংশোধনে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে অনুসৃত রীতি সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

রাজনীতির পরিবর্তন এক শ্বাসত ব্যাপার। রাজনীতির পরিবর্তন আধুনিকতা ও প্রগতির লক্ষণ। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে রাজনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। আর রাজনীতির পরিবর্তন ও প্রগতির সাথে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও আবশ্যক হয়ে যায়। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশের সংবিধানে সংশোধনীর বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধানের এ পর্যন্ত ১৫টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনের পদ্ধতি বেশ জটিল। এটি সাধারণ আইন প্রণয়নের মতো পরিবর্তন করা যায় না। তাই সংবিধান সংশোধনের প্রাক্কালে কতিপয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

কাঠামোগত ভাবে বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের (Rigid constitution) অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একে পার্লামেন্টের সাধারণ আইন প্রণয়নের মতো সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না। এর পরিবর্তনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অন্তত দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন সংবিধানের কোন ধারার সংশোধনীতে। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির ন্যায় জটিল নয়। একে যতদুর সম্ভব 'সুপরিবর্তনীয়' করা হয়েছে। তবে তা বৃটেনের সংবিধানের সংশোধনীর মতো সুপরিবর্তনীয় নয়। সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্টের) আইন দ্বারা সংবিধানের যে কোন বিধান সংশোধিত বা রহিত করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধনীর জন্য তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। সিনেটের অনুমোদনের পর তাতে আবার প্রেসিডেন্টেরও অনুমোদন দরকার। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে লিখিত সংবধিান না থাকায় কার্যত সরকারী দল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্টতায় সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। ভারতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ লোকসভা একক ক্ষমতার অধিকারী। তবে তা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় করা যায় না। বস্তুত বিশ্বের কোথাও লিখিত সংবিধান সাধারণ সংখ্যাভোটে সংশোধন করা যায় না। সংবিধান অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও ঐকমত্যের দলিল হওয়ায় প্রতিটি রাষ্ট্রই সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ ও রীতি অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন বা রহিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে এ জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হয় :

১। শিরোনাম/বিষয় নির্ধারিণ: সংশোধনী বা রহিতকরণের জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পন্ন শিরোনামের উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করা হবে, তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না।

২। সংসদ কর্তৃক গ্রহণ: সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।

৩। রাষ্ট্রেপতির অনুমোদন: বিলটি সংসদ কর্তৃক যথা নিয়মে গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হলে রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দেবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি উক্ত সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিতে অসমর্থ হন তবে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। এর সহজ অর্থ দাঁড়ায় সংবিধান সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির আপত্তি তেমন একট গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে তিনি কেবল সংসদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতির পঞ্চম সংশোধনী আদেশ (১৯৭৮) এ বলা হয়েছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি নিকট উপস্থাপন করা হলে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিলে সম্মতি দেবেন কী না তা নির্ধারণ করার জন্য সাত দিনের মধ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। গণভোটে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হলে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে, অন্যদিকে যদি বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয় তাহলে বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেই বলে গণ্য হবে। সদ্য সমাপ্ত ১৫ তম সংশোধনীর ক্ষেত্রে অবশ্য গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে। নতুন সংশোধনী আইন অনুযায়ী অধিকার, ক্ষমতা, গ্রহণ, নির্বাচন, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত ধারা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না বলে স্থির করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি একটি জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানের সংশোধন একটি অনিবার্য বিষয়। তাই সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তা সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৫

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনীর নিয়মাবলী ও পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল নয়, সংশোধনের পদ্ধতি আলোচনা সাপেক্ষে এ মন্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৬: বাংলাদেশ সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- উত্তম সংবিধান বলতে কি বুঝায় তা লিখতে পারবেন।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। এর দ্বারাই 'মূল্যবোধের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দ' (authoritative allocation of values) নিশ্চিত হয়ে থাকে। সংবিধান রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। তা নাগরিকের জীবন বিকাশে প্রয়োজনীয় অধিকার সমূহও ঘোষণা করে। আবার সংবিধান একটি জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীলতাও ধারণ করে। সংবিধানহীন রাষ্ট্র মহা সমুদ্রে কম্পাসবিহীন জাহাজের সঙ্গে তুলনীয়। এজন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটল বলেছেন, 'Constitution is the way of life that the state has chosen for itself.' বাংলাদেশের সংবিধানকে সারাবিশ্বে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মডেল সংবিধান হিসাবে অভিহিত করা হয়। বিশ্বের খ্যাতিম্যান অনেক আইন ও রাজনীতিক অকপটে বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। তবে তাদের এ উক্তি কতটা সত্য তা আলোচনার দাবী রাখে। আমরা বর্তমান পাঠে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বা উত্তমতা যাচাই করবো।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উত্তম সংবিধান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক, অর্থনৈতিকি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। নিচে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হলো-

১। সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা: উত্তম সংবিধান হবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এটির প্রধান নীতিসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে লিখিত থাকে। এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয় না। সংবিধানের ভাষা ও ব্যাখ্যায় কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

২। সংক্ষিপ্ততা: সংবিধানে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখা থাকবে।তবে তা হবে সংক্ষিপ্ত।এসব দিকের যা কিছু অপরিহার্য শুধু তাই লেখা থাকবে। K.C. Where (কে.সি. হুয়ার) বলেন, "আদর্শ সংবিধানের একটি জরুরি বৈশিষ্ট্য হল এটা যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে।" (One essential characteristics of the ideaslly best for of constitution that it should be as short as possible.)

৩। ব্যাপকতা: সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ পদ্ধতি, শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের রূপরেখা প্রভৃতি সম্পর্কে সংবিধানে উলে- খ থাকা উচিত।

৪। লিখিত: উত্তম সংবিধান হবে লিখিত। কেননা লিখিত সংবিধান অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। অলিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধের সুযোগ রয়েছে। বস্তুত বৃটেন ছাড়া বিশ্বের কোথাও অলিখিত সংবিধানের নজির নেই। কাজেই উত্তম সংবিধান লিখিত হওয়া উচিত।

৫। স্থায়িত্ব: স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংবিধান স্থায়ী হলে তা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এনে দেয় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়।

৬। মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ: উত্তম সংবিধানে অবশ্যই জনগণের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকবে। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উলে- খ থাকলে সরকার কখনও সেচ্ছাচারী হতে পারে না। এর ফলে জনগণ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং শাসন বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করতে উদ্যত হলে জনগণ অতি সহজেই সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ করতে পারবে।

৭। যুগোপযোগিতা: জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সংবিধানে প্রয়োজনে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার বিধান থাকতে হবে। এটি উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংবিধানকে অবশ্যই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। বিশ্বায়নের যুগে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সংবিধান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব -সংঘাত দেখা দেয়। এতে বিপ- বের সূচনা হতে পারে।

৮। সার্বভৌম ক্ষমতা বন্টন: সংবিধান অনুযায়ী সরকার আইনগত সার্বভৌমত্বের অধকারী এবং জনগণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। উত্তম সংবিধানে সরকার এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে যেন উভয়ের মধ্যে মধুরতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯। মধ্য পন্থার অনুসারী : উত্তম সংবিধান চরম প্রকৃতির হবে না। এটি এমন প্রকৃতির হবে না যে, সাধারন সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সরকার প্রধানের মর্জি মাফিক তা যন যন পরিবর্তন হবে। আবার এমনটিও হবে না যে, বিপপ্লব বা রক্তপাত ছাড়া তা পরিবর্তন সম্ভব নয়। অধ্যপক হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) বলেছেন, উত্তম সংবিধান বৃটেনের মতো সুপরিবর্তনীয় হবে না, আবার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতো কার্যত অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির হবে না বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকবে।

১০। সংবিধানের ভারসাম্য সংরক্ষণঃ সার্বভৌম ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাও উত্তম সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য। সরকারের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা এমন বেশি হওয়া উচিত নয়, যার ফলে আইন বিভাগ দুর্বল হতে পারে অথবা বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এত বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে আইন বিভাগ দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে। উত্তম সংবিধান তাই ক্ষমতার সুষম বন্টন এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে।

১১। সংবিধান পরিবর্তন পদ্ধতির সন্নিবেশঃ কালের বিবর্তনে উত্তম সংবিধানকে অবশ্যই পরিবর্তনশীল হতে হবে এবং এ পরিবর্তন কীভাবে সাধিত হবে তাও সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ফলে সংবিধানের যেকোন সংশোধন বা পরিমার্জনে অহেতুক বিলম্ব বা জটিলতার অবকাশ থাকবে না।

১২। জনগণের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ সংবিধানঃ জনাসাধারণের বিকাশের জন্যই সংবিধানের অবতারণা। উত্তম সংবিধান এমনভাবে সংগঠিত হবে, যেন তা জনগণের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যথায় জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বহিঃশক্তি কর্তৃক আরোপিত সংবিধান তাই কোন জনগোষ্ঠীর নিকট উত্তম হতে পারে না।

১৩। সংবিধানের প্রাধান্যঃ সংবিধানে কেবল মুখরোচক বিধিমালার সন্নিবেশ হলেই হবে না, বাস্ড্ব ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগ থাকতে হবে। উত্তম সংবিধান হেলাফেলার বিষয় নয়, সাংবিধানিকভাবেই সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। বিচার বিভাগের কর্তৃত্বঃ রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর বিচার বিভাগের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র উত্তম সংবিধানই। সংবিধান ব্যাখ্যা করার বা রাষ্ট্রের শেষ কথাটি বলার অধিকার থাকবে অবশ্যই বিচার বিভাগের। কেননা সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার রয়েছে কেবল উচ্চ আদালতের। উত্তম সংবিধান বিচার বিভাগের এই শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান কতটা উত্তম

বাংলাদেশের সংবিধান কতটা উত্তম তা উপরের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি কতটা ধারণ করতে পেরেছে সে আলোকে যাচাই করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানে আলোকপাত করা একান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোর স্বীকৃতি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু কোন অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ নেই, সেহেতু এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তনের বাস্তবতাকে কার্যকভাবেই ধারণ করেছে বাংলাদেশের সংবিধান।

দ্বিতীয়তঃ সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হলে তা যতটুকু অসামঞ্জস্য ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।। বাংলাদেশের ভূখন্ডে সর্বত্র এই সংবিধানের প্রাধান্যই স্বীকৃত।

তৃতীয়তঃ সরকারের বিভন্ন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ যাতে স্ব স্ব পরিমন্ডলে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে বাংলাদেশ সংবিধান সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুষমভাবে বন্টিত হয়েছে সংবিধানের আলোকে।

চতুর্থতঃ বিচার বিভাগের প্রাধান্য ব্যতীত জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ সম্ভব নয়- একথা ভেবেই বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকার রয়েছে বিচার বিভাগের। বিচার বিভাগের রয়েছে 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' ক্ষমতা। সংসদ অন্যায়ভাবে জনগণের অধিকার হরণ করলে কিংবা রাষ্ট্র তার এককেন্দ্রিকতা হারালে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার মাধ্যমে আদালত তা বাতিল করতে পারে।

পঞ্চমতঃ বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এ ৪টি মৌল আদর্শ বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

ষষ্ঠতঃ মৌলিক অধিকারের স্পষ্ট ঘোষণা বাংলাদেশের সংবিধানকে বিশিষ্টতা দান করেছে। জনগণের সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা-সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সম্পত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ বাংলাদেশের সংবিধান নিশ্চিত করেছে। জরুরি অবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্র জনসাধারণের এসব অধিকার সংরক্ষণে বাধ্য।

সপ্তমতঃ বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম মধ্যপন্থা অনুসরণকারী সংবিধান। বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় এবং লিখিত। অথচ প্রয়োজনীয় মূহূর্তে বাংলাদেশের সংবিধানকে অনায়াসেই সংশোধন করা যায়, কোন প্রকার সংঘাত-সংঘর্ষের পথ পরিহার করেই। প্রতিষ্ঠার ৪০ বছরে ১৫ বার সংশোধন বাংলাদেশের সংবিধানের এ নমনীয়তাকেই নির্দেশ করে।

অষ্টমতঃ বাংলাদেশের সংবিধান কোন 'বাণী চিরন্তনীর' সমষ্টি নয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্ধন-পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি যুগোপযোগী হয়।

নবমতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একটি বিস্তারিত লিখিত দলিল। সংবিধানটি ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং তাতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, একটি প্রস্তাবনা ও তাতে ৪টি তফসিল রয়েছে। এই সংবিধান দীর্ঘ তবে দীর্ঘতর নয়। লিখিতরূপ বাংলাদেশের সংবিধানকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

দশমতঃ লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হলেও বাংলাদেশের সংবিধান কিছুটা নমনীয় প্রকৃতির। পরিবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত জটিল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের দু-তৃতীয়াংশের অনুমোদনে যেকোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থ্যাৎ এজন্য কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না।

একাদশতঃ বাংলাদেশের সংবিধানে সকল জনগোষ্ঠীর সমস্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজের অনগ্রসর অংশের স্বার্থে বিশেষ বিধানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অনগ্রসর বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(৩) ধারায় বিশেষ বিধানস্বরূপ নারীর জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষিত রাখা। এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসাধারণের সার্বিক মুক্তির বার্তা এই সংবিধান। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই লিখিত দলিলে। নমনীয় প্রকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানকে করেছে যুগোপযোগী। একাধিক সংশোধনীর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনী এই সংবিধানকে করেছে আরো পুষ্ট এবং কল্যাণকামী। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রণীত ৪টি রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির পুনর্বার স্বীকৃতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে করেছে সুস্পষ্ট। এগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আর তাই এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.৬

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. উত্তম সংবিধান বলতে কি বোঝায়? উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশের সংবিধান কিরূপ? আলোচনা করুন।

পাঠ-৭: বাংলাদেশে সুশাসন সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সুশাসন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সুশাসনের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা সমূহ নির্ণয় করতে পারবেন।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ও শাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ (phenomenon)। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন সব ক্ষেত্রেই সুশাসন জরুরি। তৃতীয় বিশ্বে সুশাসনের সমস্যাকে সব সমস্যার মূল কারণ হিসাবে সনাক্ত করেছে দাতারা। তাদের মতে, এসব রাষ্ট্রে সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। তবে এর থেকেও বড় সমস্যা হলো সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি। একটি বহুমুখী ধারণা হিসেবে (Multi-dimentional) সুশাসনের উদ্ভব হয় মূলত ১৯৯০ এর দশকে। 'সবুজ বিপ্লব' আর কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ব্যর্থতার পর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নের শর্ত হিসাবে এ ধারণার অবতারনা করে। মোটা দাগে সুশাসনের প্রধান ক্ষেত্রে সমূহ হলো-

(ক) রাজনৈতিকঃ গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ
(খ) অর্থনৈতিকঃ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বেসরকারীকরণ
(গ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঃ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার
(ঘ) তথ্য ও প্রযুক্তিঃ গ্লোবাল ভিলেজ নির্মাণের স্লোগানে বিশ্বজুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার।

সুশাসনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাবার জন্য নব্বই দশকে শাসনব্যবস্থায় একটি নতুন ধারণার অবতারণা হয়েছে। এই ধারণাটি হলো নানা ধরনের এজেন্সি ও দাতাসংস্থা প্রদত্ত গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন সম্পর্কিত ধারণা। সুশাসনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ স্থায়ী সচিব Sir Kennth Stowe সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে কতগুলো বিষয়ের কথা উলে- খ করেছেন। যেমন :

ক. রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং একটি নির্বাচিত আইনসভা;
খ. ব্যক্তিসত্তার অধিকার সংরক্ষণে সংবিধান এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা;
গ. স্থিতিশীল মুদ্রাব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামজিক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
ঘ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন;
ঙ. একটি স্বাধীন নির্বাচিত আইনসভার কাছে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা;

বিশ্বব্যাংকের মতো নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সুশাসনের অপরিহার্য উপাদান;

ক. সরকারি ও অর্থনৈতিক কাজে দক্ষতা;
খ. স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা;
গ. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
ঘ. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন;
ঙ. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক;
চ. প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতা;
ছ. আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ;
জ. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো;
ঝ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা;

অন্যদিকে পশ্চিমা দেশগুলো সুশাসনের চারটি দিকের কথা উল্লেখ করেছে। তাদের মতে-

ক. সুশাসন হলো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা।
খ. সুশাসন প্রক্রিয়া অবশ্যই আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য আইনের মাধ্যম রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ।
গ. সুশাসন হলো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণ।

ঘ. প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর শক্তিশালীকরণ।

বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে সুশাসন সর্বজনগ্রাহ্য স্লোগান হলেও তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মূলত পাঁচ প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপ :

১। **জবাবদিহিতার অভাব:** বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি করেনা। রাজনৈতিক নেতারা কার্যত জবাবদিহিতার উর্ধে। তাছাড়া নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

২। **আমলাদের অনীহা:** বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের একটি অন্যতম বাধা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। এর ফলে সাধারণ জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তৈরী হয় পদে পদে ঘুষ দেবার সংস্কৃতি। প্রশাসনের অনেক জটিল ও কঠিন কাজ আমলারা অতি সহজে পরিচালনা করতে পারে। কারণ প্রশাসনের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ড় ব্যাপক। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কজে লাগিয়ে আমলারা নীতি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন বাধাগ্রস্ড় করে। বাংলাদেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্বচ্ছ উন্মুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে আমলাদের ক্ষমতা কমে যাবে- এই আশঙ্কায় আমলারা কখনই চায় না দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।

৩। **পুরানো আইনের সংস্কার না হওয়া :** পুরনো, অপর্যাপ্ত ও অপ্রাসঙ্গিক বহু আইন প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত থাকায় সাধারণের পক্ষে এসকল আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও যথার্থ অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণে আমলারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনাচার বৃদ্ধির সুযোগ পায়, যা সুশাসনের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৪। **দুর্নীতি :** প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাদের ওপর অর্পিত কাজ রাষ্ট্রের কোটি জনতার ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাদের নৈতিক শিক্ষা নিম্নমানের হলে সেবার মানসিকতা, ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি হয় না। রাজনীতিবিদ ও আমলারা যদি দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তবে সুশাসন বাস্ড়বায়ন অসম্ভব ব্যাপার।

৫। **প্রশাসনিক দলীয়করণ :** বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্ড়রায় হলো প্রশাসনিক দলীয়করণ। সকল রাজনৈতিক দলই প্রশাসনকে নিজেদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর এর ফলে যোগ্য লোক নিয়োগ পায়না। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিয়োগ পেলেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পায়না দলীয় বিবেচনায়। আর এ কারণে রাষ্ট্র একদিকে মেধাবী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে তা দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ

নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণ, জীবন মান বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রেই সুশাসন জরুরি। দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচনী বিরোধ, রাষ্ট্র প্রশাসনে সামরিক হস্তক্ষেপ সর্বোপরি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠান বড় বাধা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৭

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সুশাসন বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা সমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৮: বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা দূরীকরণের দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন।

সুশাসন নিশ্চিত করার উপায়

নিম্নে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় পর্যালোচনা করা হলোঃ

১। **জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** জবাবদিহিতা বলতে আমরা বুঝি নিজের কাজ সম্পর্কে অন্যের কাছে ব্যাখ্যা প্রদান করা। বাংলাদেশের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করেনা। তাছাড়াও নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রশাসনের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। **উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান:** সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আমলাদের মধ্যে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করতে হবে। 'সততা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা কোন উচ্চ শ্রেণীর পেশাদারী সংগঠনের প্রধান শর্ত '-এই বোধ জাগ্রতকরণের মাধমে প্রশাসকদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩। **মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ:** সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক ও দক্ষতাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের দ্বারা প্রশাসনকে জবাবদিহিতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব যা সুশাসনে সহায়ক হবে।

৪। **স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা:** পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণ বিচার ব্যবস্থার আওতায় অথবা বিশেষ বিচারের আওতায় আমলাতন্ত্রের কোন অন্যায় বা দুর্নীতির বিচার ও শাস্ড়ি প্রদানের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। আর এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠত করা যাবে সুশাসন।

৫। **পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা:** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মসম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময়মীমা, গুণগত মান যাচাই এবং নির্দিষ্ট সময়ে কর্মসম্পাদনের পরিমাণগত দিক বিবেচনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। **রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিককীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে, তবে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

৭। **আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতা :** দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্মের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৮। **প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা :** দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। উপরন্ড়ু প্রচারমাধ্যম দুর্নীতি রোধ ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে ভুমিকা রাখে। তাই প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৯। **রাজনৈতিক সদিচ্ছা :** দেশে সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।। একমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যই পারে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করতে।

সার-সংক্ষেপ

সুশাসনের বহুবিধ অর্থ রয়েছে। এটি রাষ্ট্রের বাস্তবতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, স্বাধীন ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী সরকারি প্রতিষ্ঠান, সুষ্ঠু নির্বাচন, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৮

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যাসমূহ কিভাবে দুর করা যায় তা আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশে কিভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় তা আলোচনা করুন।

পাঠ-৯: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পররাষ্ট্রনীতি কি তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্র অবশ্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। এজন্য জার্মান রাষ্ট্রনায়ক ও আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম রূপকার বিসমার্ক বলেছেন, 'অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো পররাষ্ট্র নীতি।' পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেরও নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা

পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ (National interest) রক্ষা করা। পররাষ্ট্রনীতির ইংরেজি পরিভাষা হলো `Foreign Policy' । মূলত নীতি হলো `a guideline for action'। অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড, লিঙ্কন ও অলভির মতানুসারে নীতি হলো কোন প্রক্রিয়ার সম্যক ফল, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলী অর্জন ও স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কোন রাষ্ট্র তার বিস্তৃত লক্ষ্য ও স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট কার্যে পরিণত করে। তবে যে কোন রাষ্ট্রের এ নীতিকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে- অভ্যন্তরীণ নীতি বা `domestic Policy' এবং পররাষ্ট্রনীতি বা `Foreign Policy'।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

কোন রাষ্ট্রই খেয়াল-খুশিমত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারে না। পররাষ্ট্র নীতির প্রধান নির্ধারক জাতীয় স্বার্থ। কতকগুলো বিষয় রয়েছে যা পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। এসব বিষয়কে নির্ধারক বা Determinants বলা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. অভ্যন্তরীণ নির্ধারকসমূহ ও

২. বহিঃস্থ নির্ধারকসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ নির্ধারকসমূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

ক. **স্থায়ী নির্ধারক :** ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি। মূলত এগুলোই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির স্থায়ী নির্ধারক। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত ও চীন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ. **অস্থায়ী নির্ধারক :** রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জনমত, রাজনৈতিক দল, সংসদ, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যমের ভূমিকা, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক সংস্থা ইত্যাদি। এসব বিষয়াবলী বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হল :

১. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্তার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা। সেই সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখন্ডতা বজায় রাখা। এক্ষেত্রে কোন শক্তির কাছে বাংলাদেশের আপোষ নেই।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত ভূন্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। মূলত বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি আসে। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে সহযোগিতার বিশ্ব। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যেও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এটিও একটি উদ্দেশ্য।

৪. অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক: একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আগ্রহী। কারো অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করা বাংলাদেশ কামনা করেনা।

৫. সকল প্রকার বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য।

৬. বাংলাদেশ তার নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও প্রয়োগে আগ্রহী। বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের সম্মান বৃদ্ধি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটা উদ্দেশ্য।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআর) আকৃষ্টকরণ, পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জন ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

সার সংক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক-সামরিক স্বার্থ, জনমত, সরকারের কাঠামো, বিশ্বরাজনীতি প্রভৃতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক।

পঠোত্তোর মূল্যায়নঃ ৮.৯

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

৩. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।